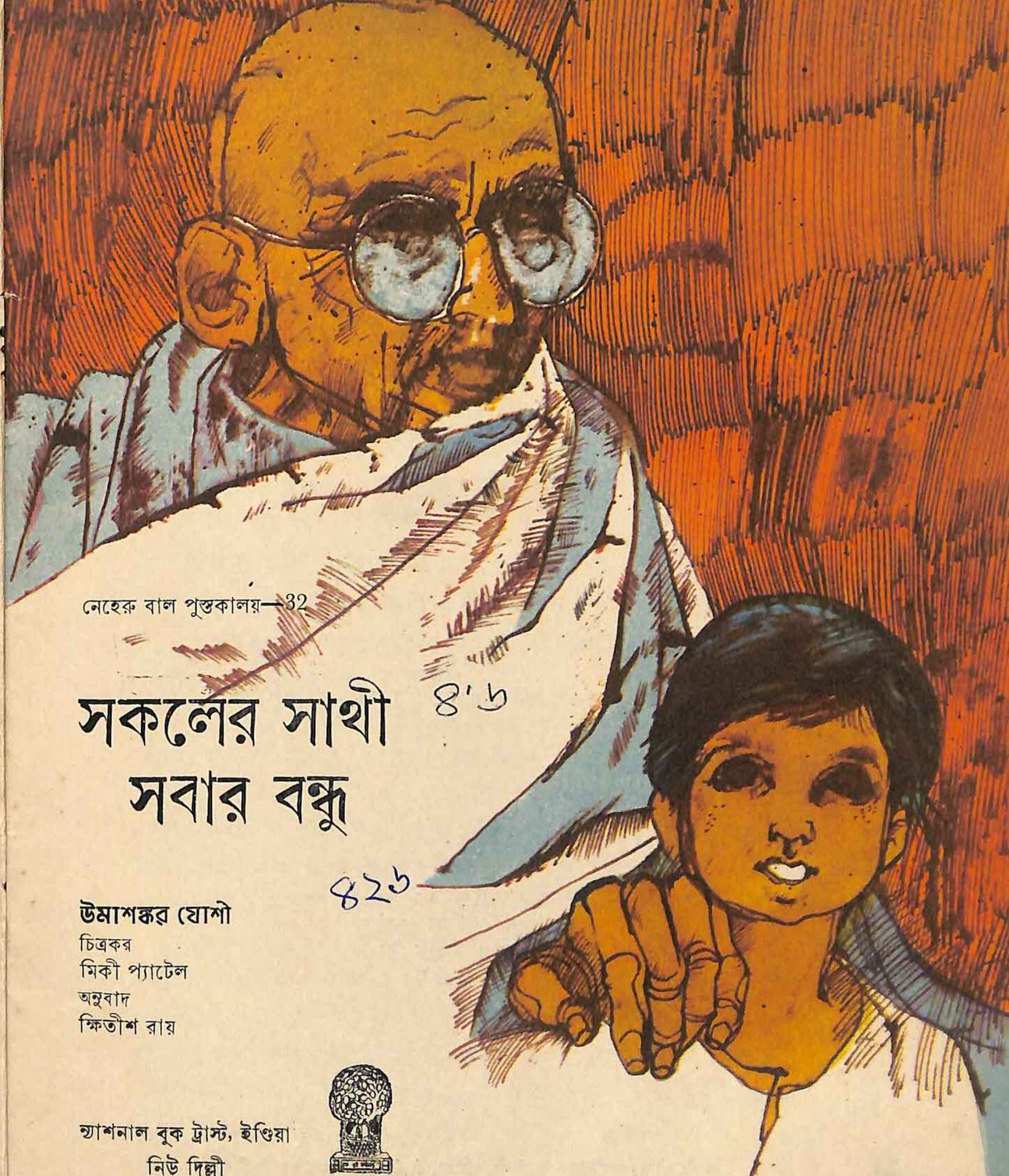
নেহরু বাল পুস্তকালয়

NEHRU BAL PUSTAKALAYA



সকলের সাথী সবার বন্ধু

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া



নেহেরু বাল পুস্তকালয়—32

সকলের সাথী সবার বন্ধু

উমাশঙ্কর যোশী
চিত্রকর
মিকী প্যাটেল
অনুবাদ
ক্ষিতীশ রায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নিউ দিল্লী

এপ্রিল 1974 (বৈশাখ 1896)

National Book Trust India
REVISED PRICE Rs.5.00

STORIES FROM BAPU'S LIFE *(Bengali)*

ডিসট্রিবুটার :
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমান্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-1

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, A-5, গ্রীন পার্ক, নয়া দিল্লী-16
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-4 দ্বারা মুদ্রিত।

সে রাতটা কী ঘুট ঘুটে অন্ধকার। এমনিতেই মোহনের ভারি ভূতের ভয়। আঁধারে একলা চলতে গিয়ে সর্বদা সশঙ্ক পাছে আনাচে কানাচে থেকে ভূত এসে পথ না জুড়ে দাঁড়ায়। সে রাতে এমনি ঘন অন্ধকার যে নিজের আঙল পর্যন্ত ঠাহর করা যাচ্ছিলনা। অথচ শোবার ঘর থেকে একবার না বেরালে নয়। দরজার বাইরে পা দিতেই পাদুটো যেন জমে গেল। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

ভাগ্যিস পাশের ঘরে পুরানো দাসী রম্ভা তখনো জেগে। হেসে হেসে জিগেস করল, "কি হ'ল রে মোহন?"

"আমার যে ভারি ভয় করছে, রম্ভাদিদি", মোহন বলল।

"দূর পাগলা, ভয় আবার কিসের?"

"কী গভীর অন্ধকার দেখছো তো। ভূতপ্রেত যদি ঘিরে ধরে," ফিসফিস করে মোহন বলল।

স্নেহভরে মোহনের মাথায় হাত বুলিয়ে রম্ভা বলল, "অন্ধকার হলে কেউ কি ভয় পায় রে? মুখে রাম নাম নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। তাহলে কেশাগ্র স্পর্শ করা তো দূরের কথা, ভূত পিশাচ মানুষের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে ভয় পায়। রাম তোকে রক্ষা করবেন।"

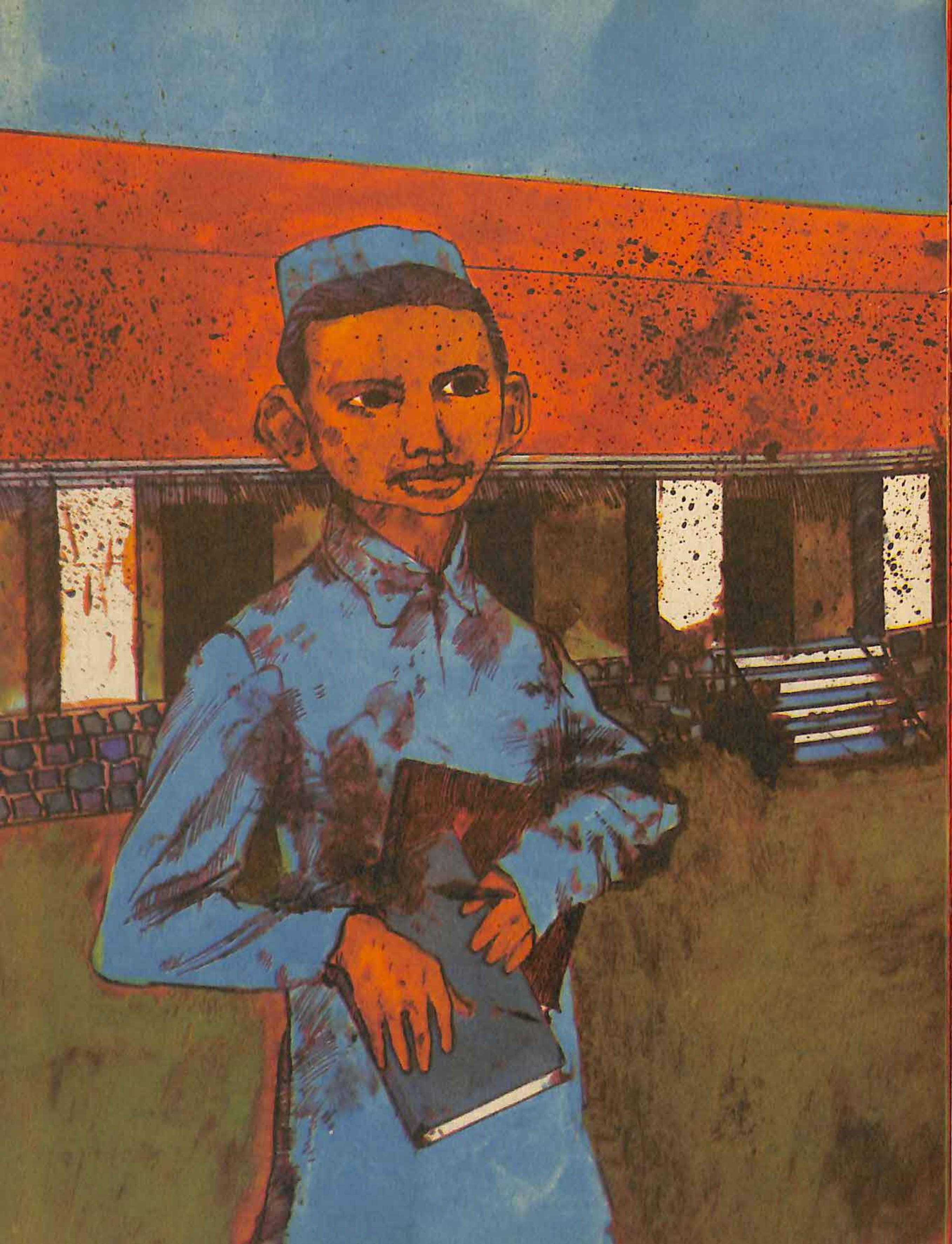
রম্ভার কথা শুনে মোহন তার মনের জোর ফিরে পেল। সাহসে বুক বেঁধে রামনাম করতে করতে সে এগিয়ে গেল।

সে দিন থেকে মোহনের মন থেকে ভয়ডর ঘুচে গেল। সব সময় ওর মনে হত ও তো আর একা নয়। মনে বিশ্বাস জন্মাল রাম যদি ওর সঙ্গে থাকেন কেউ ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।

তখন থেকে তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র হল রাম নাম। এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্তেও মুখে রাম নাম নিয়েই তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন।









মোহনের স্বভাবটা ছিল ভারি লাজুক। স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়তেই সে তার পুঁথিপত্র সামলে নিয়ে ছুটত তার বাড়ির দিকে। অন্য ছেলেরা কেউ কেউ রাস্তা চলত বন্ধুদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে করতে। কেউ কেউ রাস্তাতেই খেলাধুলো জমাত। কেউ-বা খেত জলখাবার। কিন্তু এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে মোহন সোজা বাড়িমুখো ছুটত। সারাক্ষণ ওর ভয় রাস্তায় পাকড়াও করে ছেলেরা ওকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করবে।

স্কুলে একদিন এলেন ইনস্পেক্টর। নাম তার মিস্টর গাইল্‌স। মোহনদের ক্লাসে এসে তিনি ছেলেদের পাঁচটা ইংরাজী কথা লিখতে দিলেন। এক কেবল 'কেট্‌ল' কথাটা ছাড়া বাকী সব কথা মোহন ঠিকঠাক লিখে ফেলল। মাস্টার লক্ষ্য করলেন মোহন 'কেট্‌ল' কথাটা লিখতে পারেনি। ইনস্পেক্টরের দৃষ্টি এড়িয়ে মোহনকে তিনি ইসারা করলেন যাতে সে পাশের ছেলের সেলেট দেখে কথাটা টুকে নেয়। মোহন কিন্তু হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে রইল। ক্লাশের আর সব ছেলেই কথা পাঁচটা নির্ভুল লিখেছে। কেবল মোহন লিখেছে চারটি কথা মাত্র।

ইনস্পেক্টর চলে যেতে মাস্টার তো মোহনের প্রতি চটে অস্থির।

বললেন, "আমি তো চোখ ঠেরে বলেই ছিলাম পাশের ছেলের সেলেটটা দেখে টুকে নিস কথাটা। তোর দেখছি নকল করাও আসেনা!"

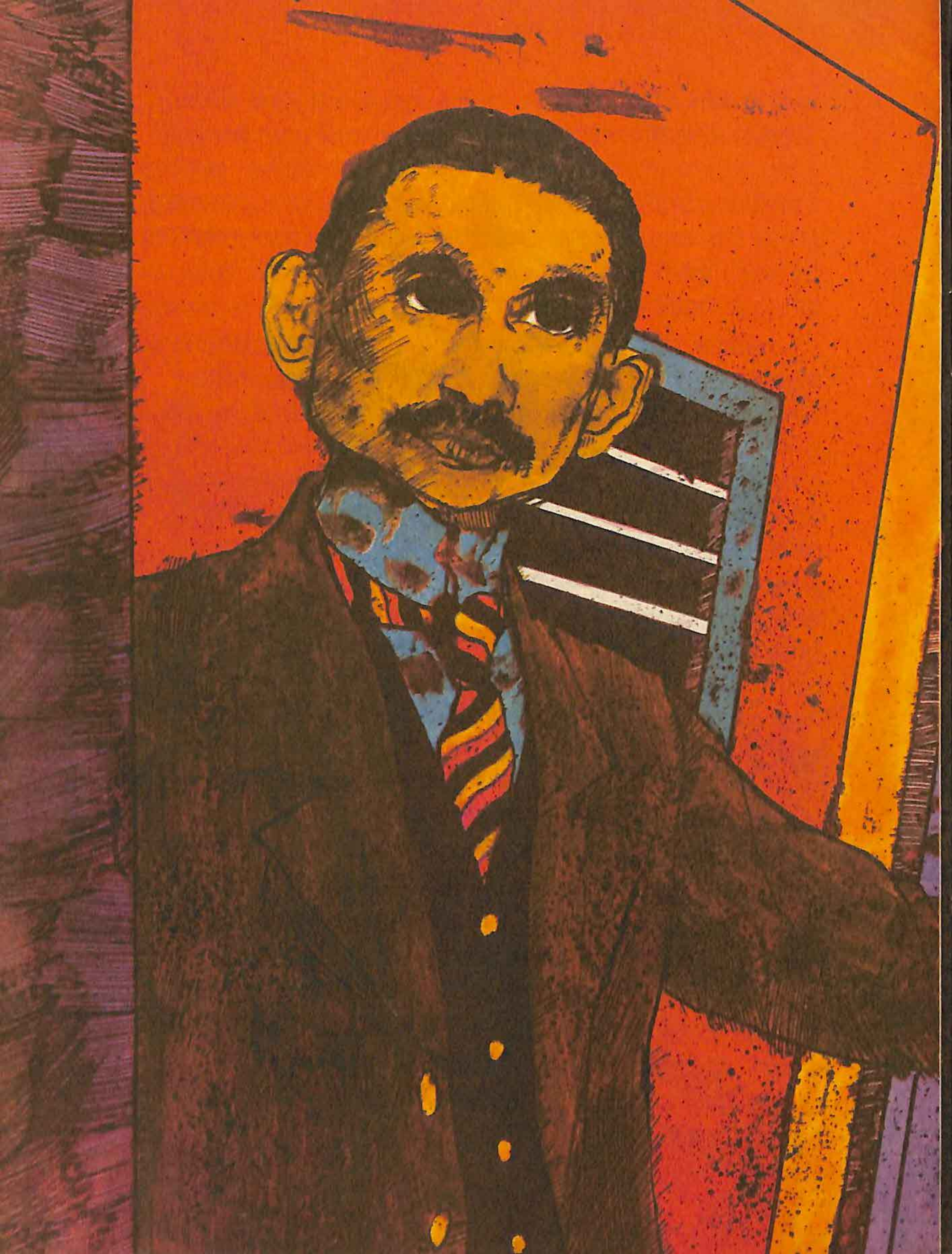
সমস্ত ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল।

ঘরে ফিরে গেল যখন এই ঘটনা নিয়ে মোহনের মনে কোনো দুঃখ হলনা। সে ঠিকই বুঝেছিল সে যা করছে ঠিক কাজই করেছে। তবে একটা ব্যাপারে সে দুঃখিত হয়েছিল বৈ কি— মাষ্টারমশায় স্বয়ং কেন যে ওকে নকল করতে বললেন। বরঞ্চ তাঁর উচিত ছিল টোকাটুকি বন্ধ করা।

গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সেখানে ফিনিক্স বলে একটি জায়গায় তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি স্কুলও খোলা হয়েছিল। সেখানে বাপু তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে ছোটদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। অন্য স্কুলের পরীক্ষায় যে ভাবে নম্বর দেওয়া হত সে তাঁর মনঃপুত ছিল না। আশ্রমের স্কুলে তিনি চাইতেন ছোটদের সত্যকার শিক্ষা দিতে—এমন শিক্ষা যা হতে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, আচার ব্যবহারও উন্নত হয়।

পরীক্ষার নম্বর দেবার পদ্ধতিও তাঁর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সকল ছাত্রকে একই রকমের প্রশ্ন করা হত। ছেলেমেয়েরাও ছিল একই শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু প্রায়ই, যে-ছাত্র কম নম্বর পেত, তার তিনি প্রশংসা করতেন, এবং যে-ছাত্র বেশি নম্বর পেত, তাকে ধমকাতেন। তাঁর এই নম্বর দেবার ধরণটা ছেলেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারত না। ঠিকঠাক উত্তর লিখেও কেন সে কম নম্বর পেল জিজ্ঞাসা করলে, গান্ধীজী একদিন একটি ছেলেকে কারণটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, "রাম ও শ্যামের মধ্যে কে যে বেশি বুদ্ধিমান সে আমি তো বলতে চাইনা। সেই হিসাবে নম্বরও আমি দিই না। আমি কেবল এইটুকু দেখতে চাই আগের বার যে যেখানে ছিল সেখান থেকে কে কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছে। কে কতটা বেশি শিখে নিতে পেরেছে। অল্পবুদ্ধি ছেলেকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করে বুদ্ধিমান ছেলে যদি বড়াই করে বেড়ায় আর ভাবে যে কেউ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবেনা, তা হলে তার বুদ্ধি শুকিয়ে যায়। অহংকার বশে সে তখন ভাবে পড়াশুনো নিয়ে তার আর খাটাখাটুনীর দরকার নেই। কাজে যে লেগে থাকে, পুরো মেহনত যে করে, একমাত্র সেই ছেলেই এগিয়ে যেতে থাকে। তাকেই আমি বেশি করে নম্বর দিই।"

বেশি যারা নম্বর পেত সেই সব ছেলেদের উপর তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। তারা বেশি বেশি শিখছে কিনা—সেদিকে তাঁর বরাবর খেয়াল থাকত। বেশি নম্বর পাবার ফলে যদি তার দেমাক বাড়ে, তাতে কি তার মঙ্গল হয়? এই কথাটুকু তিনি ছেলেদের মনে গেঁথে দিতেন। যে-ছেলের বুদ্ধি একটু কম সে যদি খেটেখুটে পরের পরীক্ষায় নম্বর বেশি পেত, বাপু তাকে বলতেন, "সাবাস, বাহাদুর ছেলে।"





বাপু তখন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহনসবার্গ শহরে ওকালতী করতেন। বসতবাটী থেকে তাঁর দফতর ছিল মাইল তিনেক দূরে। গান্ধীজীর সহকর্মী পোলক সাহেব একদিন গান্ধীজীর তেরো বছর বয়সের ছেলে মণিলালকে বলেছিলেন দফতর থেকে একটি বই এনে দিতে। মণিলাল কথাটা ভুলে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা পোলক যখন বই চাইলেন মণিলালের মনে পড়ে গেল। কথাটা গিয়ে পৌঁছল গান্ধীজীর কানে। মণিকে কাছে ডেকে এনে পরম স্নেহে অথচ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "বেটা, রাত অন্ধকার, পথ সুনসান—সে আমি জানি। যেতে আসতে ছয় মাইল পথ। কিন্তু পোলক সাহেবকে তুমি যখন কথা দিয়েছো যে বইখানা এনে দেবে, তোমার তো এক্ষুণি গিয়ে বইটা এনে দিতে হয়।"

বাপুর এই আদেশ শুনে কস্তুরবা ও ঘরে অন্য যারা ছিল—সবাই স্তম্ভিত। এ কিরকম কঠোর শাস্তি! এই অন্ধকার রাতে নিতান্ত বালক বয়সের ছেলের পক্ষে এতটা দুর্গম পথে চলা কি সহজ কথা। ছেলেমানুষ না হয় ভুলেই গেছে তাতে হল কি? বইখানা তো কালকেও নিয়ে আসা যেতে পারে। সকলের মনেই এই ধরনের চিন্তার উদয় হল বটে, কিন্তু কারো সাহস হলনা মুখ ফুটে কিছু বলে। সবাই জানে বাপুর মুখের কথার নড়চড় হবার জো নেই।

থমথমে ভাবটা সাহস করে ভাঙলেন কল্যাণ ভাই। তিনি বললেন, "আমিই না হয় যাচ্ছি বইটা আনতে।"

আগের মতোই মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে বাপু বললেন, "কিন্তু কথাটা তো দিয়েছিল মণিলালই।"

কল্যাণজী বললেন, "বেশ তো, মণিলালই যাবে। কিন্তু আমায় ওর সঙ্গে যেতে দিন।"

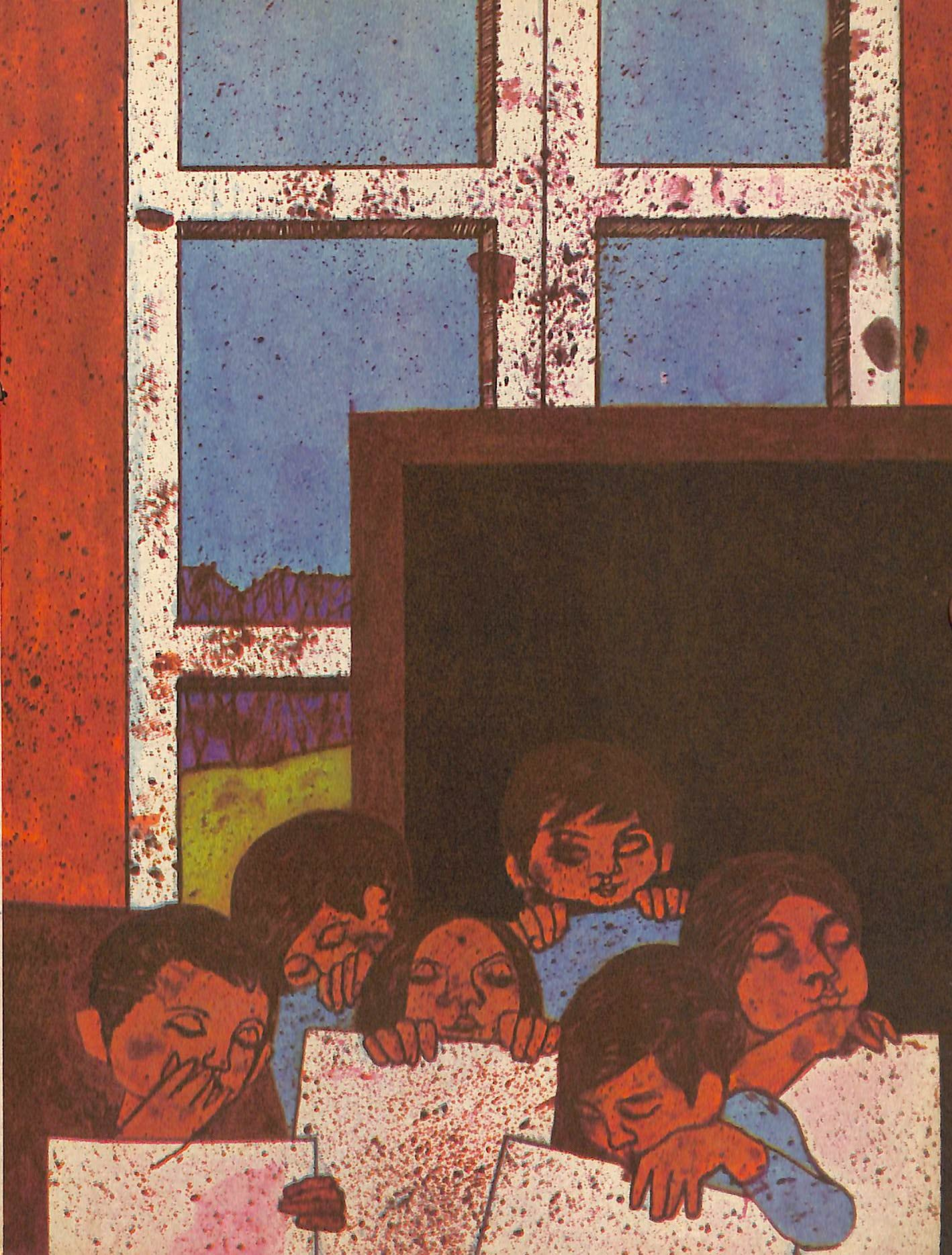
বাপু আপত্তি করলেন না।

মণিলাল কল্যাণজীর সঙ্গে দফতর গেল ও সেখান থেকে বইখানা এনে দিল পোলক সাহেবের হাতে।

ফুলের মতো কোমল আর বজ্রের চেয়ে কঠোর ছিলেন বাপু। মণিলাল যে কাজ করবে বলে কথা দিয়েছিল সে কাজ সমাধা না করা পর্যন্ত ছেলেকে তিনি রেহাই দেন নি।











সে বছর কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল বোম্বাই শহরে। গান্ধীজী তখন সদ্য সদ্য আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরেছেন। অধিবেশনের কাজে গান্ধীজীর সহায়তা করার জন্য সামিল হয়েছিলেন কাকা সাহেব কালেলকর।

একদিন দেখা গেল নিজের টেবিলের আশে পাশে গান্ধীজী হন্তদন্ত হয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সেই ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখে কাকা সাহেব জিগেস করলেন, "কী খুঁজছেন বাপু?"

বাপু বললেন, "আমার পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে—ছোট একটা পেন্সিল।"

একটা সামান্য পেন্সিল তল্লাশ করতে গিয়ে বাপু এতটা সময় বৃথা বরবাদ করছেন, অনর্থক হয়রান হচ্ছেন—এটা ঠিক হচ্ছে না বলে মনে হল কাকা সাহেবের। চট্ করে নিজের পেন্সিলটাই দিতে চাইলেন।

"না, না, আমার নিজের সেই ছোট পেন্সিলটাই চাই।" বাপু ছোট ছেলের মতো জিদ ধরে বললেন।

কাকা সাহেব বললেন, "আহা, আপাতত এইটাই রাখুন তো। পরে আপনার সেই পেন্সিল আমি খুঁজে বের করব। ওটার পিছনে অনর্থক আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে।"

বাপু বললেন, "ওই ছোট্ট পেন্সিলটা আমার কাছে বিশেষ দামী। আপনি সে কথা কি করে আর জানবেন। ওটা আমায় দিয়েছিল মাদ্রাজে নটেশনের ছোট ছেলে। কত ভালোবেসেই না দিয়েছিল ওটা আমায়। ওটা হারিয়ে যাবে—এ আমি সইব কি করে? ওটা যে ছিল সেই ছোট্ট শিশুটির ভালোবাসার নিদর্শন।"

কাকা সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। উনি বুঝে নিয়েছেন কথা বলে কিছু লাভ হবেনা। গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে উনিও সেই পেন্সিলটা খুঁজতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পাওয়াও গেল। কাকা সাহেব দেখেন কি পেন্সিলের টুকরোটা দু' ইঞ্চির চেয়েও ছোট। পেন্সিল ফেরত পাওয়া গেল বলে গান্ধীজী তো বেজায় খুশি। ও পেন্সিল তো আর যে-সে পেন্সিল নয়—একটি শিশুর ভালোবাসার প্রতীক। আর বাপুর কাছে শিশুদের প্রেম ছিল মহামূল্য সম্পদ।

ছোট ছেলেমেয়ে অনেকেই আসত বাপুর কাছে। বাপুর বেশভূষা দেখে একদিন একটি ছোট ছেলের ভারি দুঃখ হয়। এমন মস্ত মানুষ বাপু, অথচ তার গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই। চুপ থাকতে না পেরে সে জিগেস করেই বসল, "আপনি জামা পরেন না কেন, বাপুজী ?"

ছেলেটিকে আদর করে বাপু বললেন, "আমার কাছে পয়সা কোথায় রে বেটা যে আমি জামা পরব। বেজায় গরীব আমি। জামা কিনি এমন পয়সা নেই।"

ছেলেটির মন গলে জল। সে বলে উঠল, "আমার মা সেলাই করতে জানেন। দেখুন না, আমার জামা কাপড় সবই তো মায়ের হাতে তৈরি। মাকে বলে আমি আপনার জন্য জামা সেলাই করিয়ে দেব। কিন্তু আপনি পরবেন তো, বাপু ?"

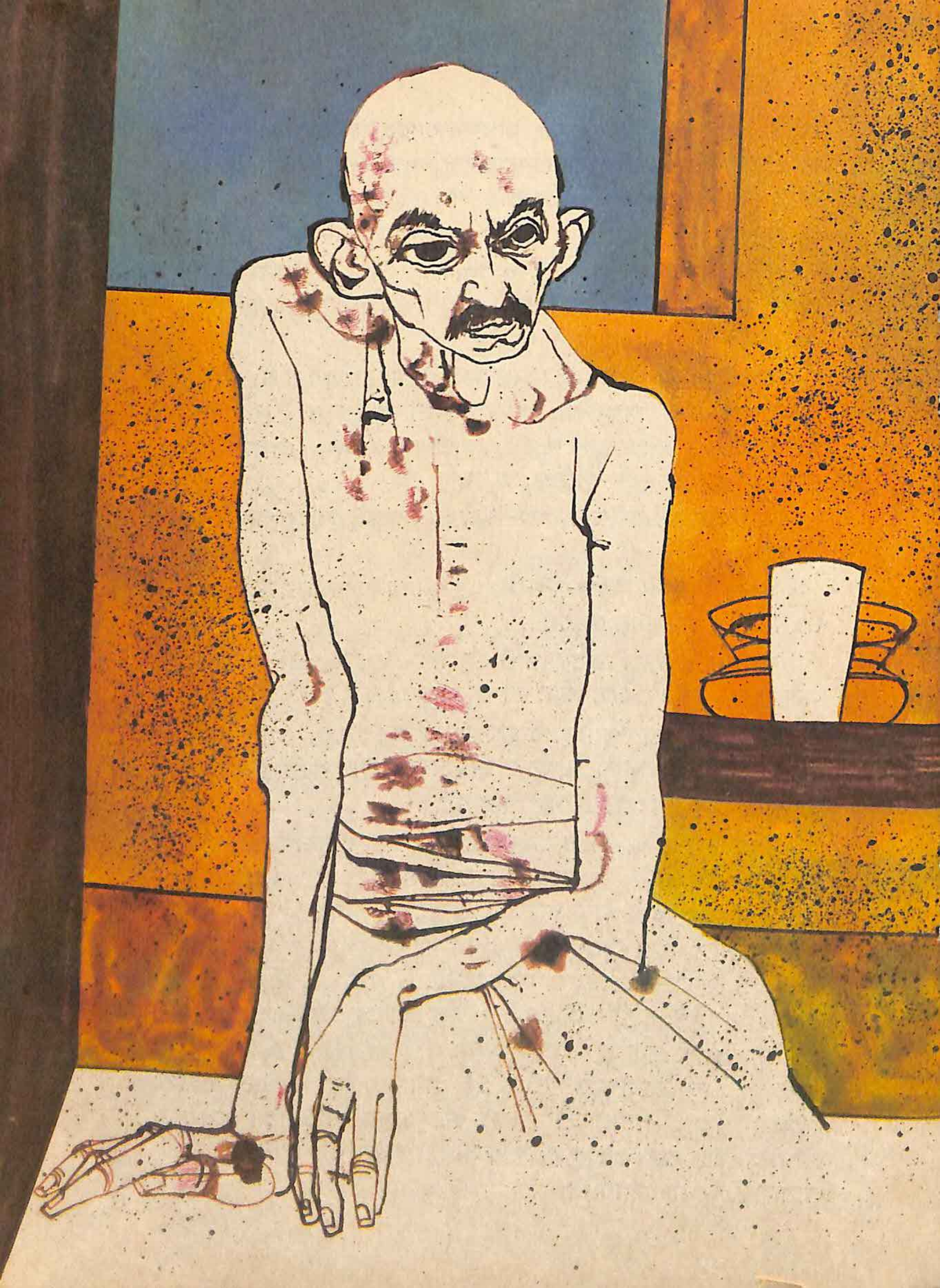
বাপু জিগেস করলেন, "ক-টা জামা সেলাই করে দেবেন তোমার মা ?"

ছেলেটি বলল, "এক-দুই-তিন, ক-টা চাই আপনার ? যে ক-টা চান, মা সেলাই করে দেবেন।"

বাপু খানিকক্ষণ চিন্তার পরে বললেন, "কিন্তু বেটা, আমি তো একা মানুষ নই। একা একা কী করে জামা পরি ?"

ছেলেটি বলল, "আচ্ছা তাহলে বলুন ক-টা জামা পেলে আপনার চলে। আমি ততগুলো মায়ের কাছ থেকে সেলাই করিয়ে আনব। বলুন না বাপু—কতগুলো চাই আপনার ?"

ছেলেটির আগ্রহ দেখে বাপু বললেন, "বেটা আমার তো ভাইবোন আছে চল্লিশ কোটি। তাদের এক জনেরও গায়ে জামা যতদিন না ওঠে, আমি কি করে জামা পরি? এবার বলো তোমার মা কি আমাদের সকলের জন্য জামা সেলাই করে দিতে পারবেন ?" এই বলে বাপু এক দৃষ্টে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেটি চিন্তা করতে লাগল ঃ চল্লিশ কোটি ভাই বোন! বাপু তো তাহলে ঠিকই বলেছেন। যতদিন এদের সকলের গায়ে জামা না চড়ে, উনি নিজে কি করে পরেন ? উনি তো সকলের চেয়ে বড়, সবার বাপু। শিশু ভোলনাথ এতক্ষণে বুঝতে পারল সারা দেশ হল বাপুর পরিবার। প্রত্যেক দেশবাসী তাঁর বন্ধু। বাপু সকলের সাথী, সবার বন্ধু। একটি মাত্র জামায় কি করে চলবে ওঁর ?









একদিন ফরবজ জেলে থাকা কালে কথায় কথায় বল্লভ ভাই প্যাটেলকে বাপু বললেন, "যাকে রাখো সে রাখে। সযত্নে রাখলে মরা সাপও কখনো কখনো কাজে লেগে যায়।" কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বাপু একটা গল্প বললেন। একবার এক বুড়ীর ঘরে সাপ বেরোল। বুড়ী চেঁচামেচি হৈহল্লা করে পাড়াপড়শী জুটিয়ে আনল। সবাই মিলে সাপটাকে সাবাড় করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। মরা সাপটাকে দূরে কোথাও না ফেলে দিয়ে বুড়ী ফেলে রাখল তার কুঁড়ে ঘরের চালের উপর।

হবি তো হ, আকাশে উড়ন্ত একটি চিলের নজর গিয়ে পড়ল মরা সাপটার উপর। চিলের ঠোঁটে ছিল একটি মুক্তার মালা—কোথা থেকে যেন তুলে এনেছিল মালাটা। হারখানা চালের উপর ফেলে দিয়ে চিল মরা সাপটাকে ঠোঁটে করে উড়ে চলে গেল। চালের উপর শাদা কী যেন ঝিকমিক করছে দেখে বুড়ী একটা বাঁশের লগি দিয়ে হাঁকড়ে সেটা নামিয়ে নিল। মুক্তার হার দেখে তার আনন্দ দেখে কে! সে আহ্লাদে নৃত্য করতে লাগল।

বাপুর গল্প শেষ হতে বল্লভ ভাই একটি গল্প বললেন। বেনিয়ার বাড়িতে সাপ বেরোল। সাপ মারে এমন কাউকে পাওয়া গেলনা। বেনিয়ার এমন সাহস হলনা যে সে নিজে সাপটাকে মারে। তাছাড়া জীবহত্যা করতেও ওর মন সরলনা। সে করল কি, সাপটার উপর একখানা বাসন চাপা দিয়ে দিল। আশ্চর্য বলতে হবে সেই রাতেই বেনিয়ার বাড়িতে একটি চোর প্রবেশ করে। উবুড় করা বাসনটা দেখে সে ভাবল নিশ্চয় ভিতরে কোনো ভালো জিনিস ঢেকে রাখা আছে। যেইনা বাসনটা উঠিয়েছে অমনি সাপটা ফোঁস করে ফণা তুলে মারল এক ছোবল। এসেছিল চুরি করতে, এখন বেচারার প্রাণ সামাল দেওয়া দায় হল।

চরকা সংঘের কাজে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য তখন গান্ধীজী শহরে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেদিনকার ঘটনা সেদিন তিনি সফর করছেন ওড়িশায়।

এক সভায় বসে গান্ধীজী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হবার পর নিতান্ত গরীব এক থুড়থুড়ে বুড়ী শ্রোতাদের ভিতর থেকে উঠে এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে। বুড়ীর চুল তো নয় যেন শনের নুড়ো। কোমর বেঁকে গেছে ধনুকের মতো। পরনে ছেঁড়াফাটা কানি। স্বেচ্ছাসেবকেরা হা হা করে তেড়ে এল তাকে বাধা দিতে, পাছে সে গান্ধীজীর দিকে ধাওয়া করে। সে কিন্তু লড়াইঝগড়া করে ঠিকই বাপুর সামনে গিয়ে হাজির হল। "দর্শন করতে আসা"—এই বলে সে বাপুর পায়ের ধুলো নিল ও খুঁট থেকে একটি আধলা পয়সা বের করে পায়ের কাছে রেখে দিয়ে চলে গেল।

আধলা পয়সাটা উঠিয়ে নিয়ে গান্ধীজী নিজের কাছেই রেখে দিলেন।

চরকা সংঘের সমস্ত হিসাব কেতাব রাখতেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ। তহবিলে জমা করার জন্য আধলাটা তিনি চাইলেন। কিন্তু বাপু সেটা দিতে রাজী হলেন না।

যমুনালালজী হেসে হেসে বললেন, "চরকা সংঘের নামে আমি হাজার হাজার টাকার চেক নিয়ে থাকি। এই আধলাটুকু আমার উপর ভরসা রেখে আপনি দিতে পারছেন না ?"

গান্ধীজী বললেন, "এই আধলা সেই সব হাজার হাজার টাকার তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান। কারো যদি লাখ দু'লাখ টাকা থাকে এবং তা থেকে দু'এক হাজার দেয়, সে আর বেশি কথা কি! কিন্তু এই আধলাটুকুই হয়তো ছিল বুড়ীর সর্বস্ব সম্বল। সে তো তার যথাসর্বস্ব দান করে গেল। কি রকম উদার কত বড় তার হৃদয়। কত মহান তার ত্যাগ! এই কারণে এই আধলাটুকুর মূল্য আমার কাছে কোটি কোটি টাকার চেয়েও বেশি।





ঘটনাটা ঘটেছিল নোয়াখালিতে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর লোকের মনে যে তুষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, সে আগুন নেভাবার জন্য গান্ধীজী তখন সেই অঞ্চলে পদযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। ভোর হতেই তিনি এক গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন আর সাতটা বাজতে বাজতে গ্রামান্তরে গিয়ে পৌঁছতেন। পৌঁছবার পর প্রথমেই সমাধা করতেন লেখার কাজ কিংবা লেখানোর কাজ। অতঃপর স্নান করতেন। স্নানের সময় পা-দুটি ঘষে মেজে পরিষ্কার রাখার জন্য তিনি একটি খরখরে পাথর ব্যবহার করতেন। পাথরটি বেশ কয়েক বছর আগে মীরাবেন তাঁকে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বাপু বিশেষ যত্ন সহকারে নিজের কাছে সেটি রাখতেন। যেখানে যেতেন পাথরটি তিনি সঙ্গে নিতে ভুলতেন না।

গ্রামান্তরে তো পৌঁছে গেছেন গান্ধীজী। তাঁর স্নানাদির ব্যবস্থা করতে গিয়ে মনুবেন দেখলেন কি পাথর তো কোথাও নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু পাওয়া গেলনা। তিনি তখন পাথরখানা হারিয়ে যাবার কথা বাপুকে জানিয়ে বললেন, "গত কাল আমরা যে তাঁতির বাড়িতে ছিলাম, সেইখানেই রয়ে গেছে হয়তো। এখন কি করি ?" বাপু কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, "তুমি নিজেই সেখানে চলে যাও আর খুঁজে পেতে পাথরখানা নিয়ে এসো। একা একাই চলে যাও। একবার যদি হয়রানি সইতে পারো তা হলে এমন ভুল আর দ্বিতীয়বার হবেনা।"

মনু জিগেস করলেন, "স্বেচ্ছাসেবক কাউকে সঙ্গে নেব কি ?"

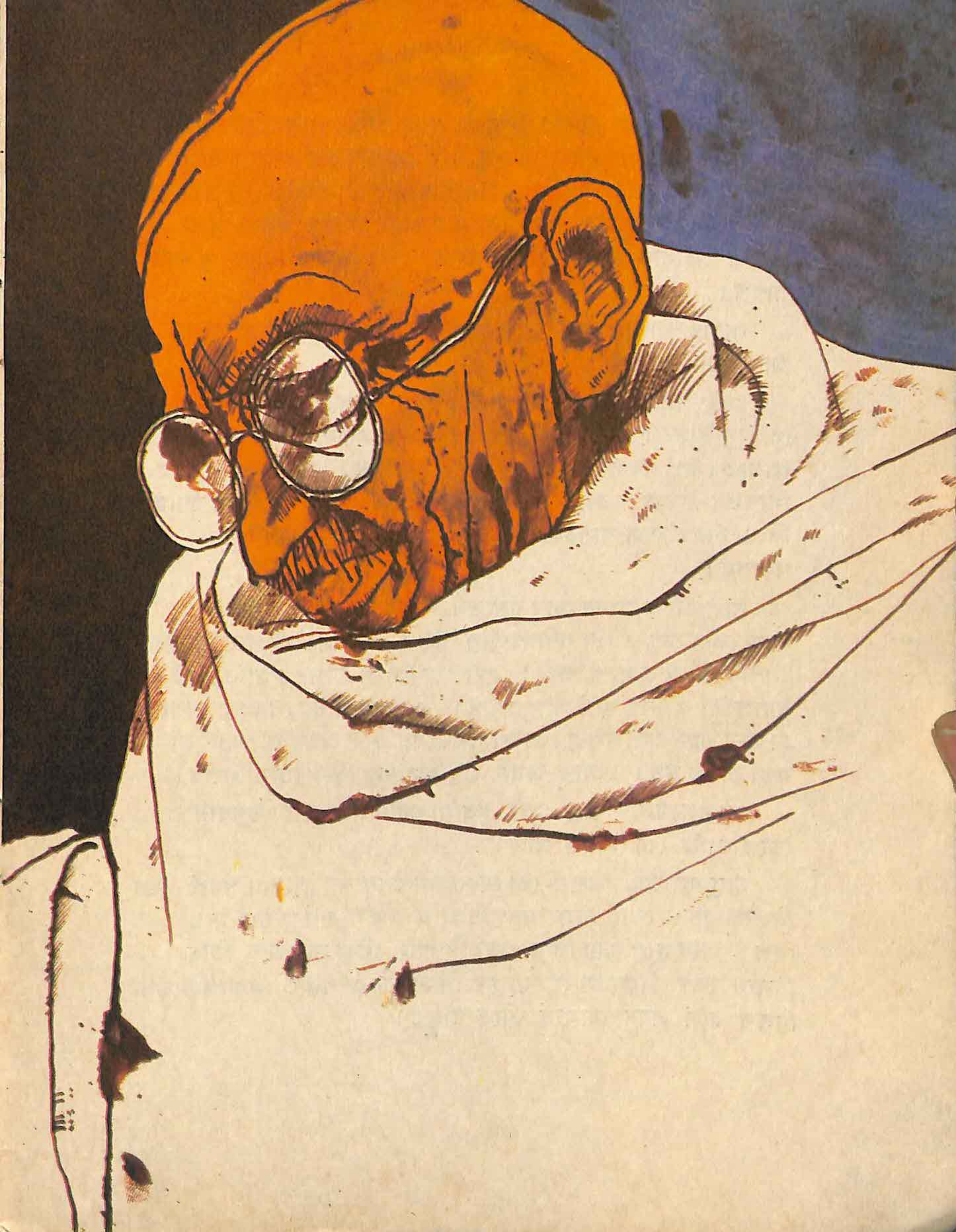
বাপু বললেন, "কেন ?"

মনু চুপ করে গেলেন। বলতে পারলেন না যে একা যেতে তাঁর ভয় করছে। ব্যাপারটা হল এই যে নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র নারকেল ও সুপুরী গাছের ঝোপ ঝাড়। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ কেটে চলতে গেলে যে-কোনো লোক পথ ভুলতে পারে। তাছাড়া সে সময় মনুর বয়স ছিল বড় জোর পনরো কি ষোলো। ইতিপূর্বে একা একা তিনি কোথাও কখনো যান নি। কিন্তু বাবুর সেই "কেন" প্রশ্নের কি যে জবাব দেওয়া যায় ভেবে তিনি কুলকিনারা পেলেন না।

যে-রাস্তা ধরে সকালবেলা সকলে মিলে এসেছেন, সেই রাস্তা ধরে মনু চলতে শুরু করলেন। পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে খুঁজে খুঁজে তিনি তো কোনো প্রকারে আগের দিনের সেই গ্রামে গিয়ে পোঁছলেন। সেই তাঁতির বাড়িটাও মিলে গেল। বাড়িতে থাকত এক বুড়ী। সে তো মনুকে দেখামাত্র চিনেছে যে এ-মেয়ে সেই মেয়ে যে নাকি গতকাল বাপুর সঙ্গে এই বাড়িতে থেকে গেছে। বুড়ী পরম স্নেহে মনুকে বাড়িতে ডেকে নিল। মনুর অবস্থা তখন শোচনীয়। একে তো







বাপুর প্রতি বিরক্তি। তার উপর এতখানি রাস্তা পায়ে হেঁটে আসার হয়রানি। যাহোক মনু বুড়ীকে বুঝিয়ে বললেন কি কারণে তাঁকে ফিরে আসতে হল। বুড়ী বেচারী কি করে আর জানবে যে পাথরখানা এমন অমূল্য। ঝাঁটপাট দেবার সময় অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে নিশ্চয় কোথাও ফেলে দিয়ে থাকবে। তবু দুজনে মিলে খুঁজতে লাগল।

নেহাৎ ভাগ্য বলতে হবে পাথরটা পাওয়া গেল। মনুর খুশির আর অবধি রইলনা।

সেই সকাল সাতটা বাজতে মনু গ্রামান্তরের বাসা ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। ফিরলেন যখন তখন দুপুর একটা বেজে গেছে। আসতে যেতে পনরো মাইল পথ হাঁটতে হয়েছে। সারা দেহে ক্লান্তি, খিদেও পেয়েছে বেজায়, মনটাও তিক্ত বিরক্ত। সোজা বাপুর কাছে গিয়ে, তাঁর কোলে পাথরটা ফেলে দিয়ে, মনু কান্নায় ফেটে পড়লেন।

বাপু তাঁকে আদর করে বললেন, "এই পাথরের ব্যাপার নিয়ে আজ তোর মস্ত একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। জানিস, এই পাথরটা হল আমার পঁচিশ বছরের সাথী। জেলে থাকি বা প্রাসাদে থাকি, এটি সদাসর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এ-রকম পাথর যে আর পাওয়া না যায় এমন নয়, কিন্তু কোনো জিনিসের প্রতি অযত্ন বা অবহেলা করা উচিত নয়। তোকে আমি এই শিক্ষাটুকু দিতে চেয়েছিলাম।"

মনু বললেন, "বাপু, যদি কখনো আমি মনে প্রাণে ভগবানকে ডেকে থাকি, তো সে হল আজ।"

বাপু বললেন, "আমি তো চাই আমার দেশের মেয়েরা সবাই যেন নির্ভীক হয়। তোর সঙ্গে আমারো আজ কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেল।" মনু মুখে আর কিছু বলেননি বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি নিশ্চয় বুঝে থাকবেন যে বাপুর শিক্ষাদানের পদ্ধতি একান্তই তাঁর নিজস্ব বলে এমন আশ্চর্য ভাবে অদ্ভুত।

REVISED PRICE Rs.5.00